ধারাবাহিক রচনা

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা অপ্রকাশিত পত্রসম্ভার

চিরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

[লেখিকা পিতৃসূত্রে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও মাতৃসূত্রে স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর প্রপৌত্রী। চিঠিগুলি তিনি পেয়েছেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রপৌত্রী অপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে, যিনি সম্পর্কে লেখিকার মামিমা। চিঠিগুলির বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।—সঃ]

বিদগ্ধ লেখক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুণের আকর্ষণে এসেছিলেন বহু জ্ঞানীগুণী মানুষ। বাংলা থেকে দূরে, সেযুগের বিহারের প্রত্যন্ত পূর্ণিয়া অঞ্চলে তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল এক অভিনব রত্নসভা। ধন্য হয়েছিল পূর্ণিয়ার মাটি। সেসময় চিঠিপত্রই ছিল যোগাযোগ স্থাপন ও মনোভাব আদান-প্রদানের একমাত্র মাধ্যম। অতএব সেই চিঠিপত্রের মধ্যেই ওই বিশিষ্ট গুণী মানুষটির জ্ঞানবিদগ্ধ সুন্দর হৃদয়টি ফুটে উঠত। কেদারবাবু বা 'দাদামশায়'কে লিখিত এমনই কিছু গুণী তারকার প্রাচীন পত্রসম্ভার রইল এখানে, যাঁদের অনেকের হাতে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বহু সোপান তৈরি হয়েছে, অথচ তাঁরা চলে গেছেন বিস্মৃতির অতলে।

প্রথমেই আসি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (১৯ জুলাই ১৮৯৯—৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯), ওরফে আমাদের প্রিয় লেখক বনফুলের প্রসঙ্গে। প্রবাসী বাঙালি। পৈতৃক নিবাস শিয়াখালা হুগলি, কিন্তু জন্ম পূর্ণিয়া জেলার মনিহারীতে। পিতা ডা. সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়। বিহারের সাহেবগঞ্জ স্কুলে পড়ার সময় ১৯১৫ সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'মালঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপর 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হয় 'বনফুল' ছদ্মনামে। ১৯২৭ সালে পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। ভাগলপুরে চল্লিশ বছর প্র্যাকটিস করেন প্যাথলজিস্ট হিসেবে। ১৯৬৮ থেকে কলকাতার বাসিন্দা। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'তৃণখণ্ড' ডাক্তারি জীবনের গোড়ার দিকের লেখা। সেইসময়ের সাহিত্যসাধনার প্রেরণাদাতা ছিলেন সাহেবগঞ্জের বটুকদা (সুধাংশুশেখর মজুমদার)। পরে কলকাতা মেডিকেল কলেজে এসে শিক্ষকরূপে পান ব্যঙ্গরচনাকার বনবিহারী

মুখোপাধ্যায়কে। তাঁরই জীবনকে ভিত্তি করে তাঁর উত্তরকালের উপন্যাস 'অগ্নীশ্বর'। ভোজনরসিক ও আড্ডাপ্রিয় বনফুলের লেখনীতে প্রবাসজীবন ভীষণভাবেই ব্যক্ত। ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, কাব্য—সমস্ত রচনাতেই দক্ষতা তাঁর। প্রায় শতাধিক গ্রন্থের লেখক তিনি। পেয়েছেন বহু পুরস্কার—রবীন্দ্র পুরস্কার, জগত্তারিণী পদক, ভাগলপুর ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট উপাধি। বাংলা সাহিত্যের ক্ষুদ্রতম ছোটগল্পের জনক ছিলেন তিনি। সেই অসামান্য 'পোস্টকার্ড স্টোরি রাইটার' বনফুলের এই চিঠি দুটিও তাঁর ওই সংক্ষিপ্ত শিল্পকলারই দ্যোতক।

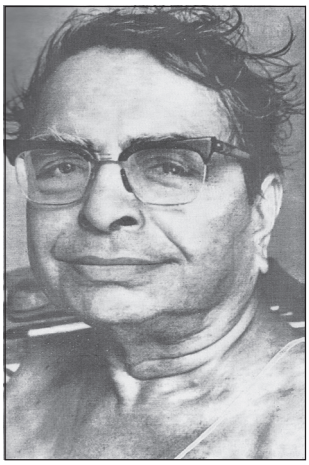

বনফুল

শ্রীচরণেষু,

দাদামশায়, ...এ মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে আপনার একটা কবিতা দেখছি। এ বয়সে আধুনিকাদের বিরুদ্ধে লেগেছেন! পারবেন না। এঁরা তত কোমলাঙ্গী নয়, মোষের চামড়া। চিমটি কাটলে সুড়সুড়ি মনে করে।

আশা করি ভাল আছেন। আমার প্রণাম নিন। প্রণত

১৮.৯.৪০ বলাই

* * *

ভাগলপুর, ২৫।১০

দাদামশাই,

মধ্বাভাবে দিত গুড় সেকালের লোক
একালের বিজ্ঞ লোক আরও বিচক্ষণ
Proxy কে বিবাহ করে অবলীলাক্রমে
Pill খেয়ে করে নাকি জীবনরক্ষণ
তাঁহাদেরি অনুসরি পোস্টকার্ডযোগে
সারিলাম বিজয়ার প্রণামালিঙ্গন।

''বনফুল''

এরপর আসি সজনীকান্ত দাসের প্রসঙ্গে (২৫ আগস্ট ১৯০০—১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২)। হরেন্দ্রলাল ও তুঙ্গলতা দেবীর এই সন্তানের পৈতৃক নিবাস বীরভূমের রায়পুরে। দিনাজপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেও রাজনৈতিক কারণে পড়া ব্যাহত হয়। তখন বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশনারি কলেজ থেকে আই এস সি ও স্কটিশচার্চ থেকে বি এস সি পাশ করেন। ১৯২৪ সালে এম এস সি পড়ার সময় অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় যোগ দেন ও 'ভাবকুমার প্রধান' ছদ্মনামে লিখতে আরম্ভ করেন। 'কামস্কাটকীয় ছন্দ' কবিতাটি প্রকাশের পর তাঁর ব্যঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ। এর কিছুদিন পরই তিনি 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক হন। এরপর 'প্রবাসী' পত্রিকায় যোগ দেন, 'বঙ্গশ্রী' ও 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকারও সম্পাদনা করেন। কবি, সমালোচক, প্রবন্ধকার, গীতিকার ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের গবেষকরূপে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। প্রথম নজরুলকে আক্রমণ করে সাহিত্য আসরে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তিনি। পরে বহু খ্যাতিমান লেখকই তাঁর সমালোচনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সমকালীন সমাজ, রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি এ-ভূমিকা পালন করেছেন। চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ রচয়িতারূপেও কুড়িয়েছেন প্রচুর সুখ্যাতি। থেকেছেন সাহিত্য ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বহু উচ্চপদে। 'মনোদর্পণ', 'পথ চলতে ঘাসের ফুল', 'অজয়', 'পঁচিশে বৈশাখ' ইত্যাদি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ ভারত স্বাধীন হওয়ার দিন বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরমের

আদলে সজনীকান্ত দাসের লিখিত 'বন্দে মাতরম্' গানটি রেডিওতে বাজানো হয়েছিল। তাঁর প্রিয় দাদামশাইকে লেখা তিনটি চিঠি দেওয়া হল।

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৪।৯।৩৯

শ্রীচরণেষু,

অকস্মাৎ আপনার পত্র পাইয়া মনটা কেমন করিয়া উঠিল, সাধ্য থাকিলে একবার গিয়া দেখা করিয়া আসিতাম। আপনাকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া দিদিমার চলিয়া যাওয়ার দুঃসংবাদটা পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম। কিন্তু এই অবস্থায় আপনাকে কোনও কিছু লিখিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই নাই। আমি জানি, আপনি আমাদের সান্ত্বনা মনে মনে অনুভব করিয়াছেন এবং আমাদের মুখ চাহিয়া দিদিমাহীন সংসারে আরও কিছুদিন কাটাইয়া যাইবার মত বল সঞ্চয় করিয়াছেন। আপনার উপর আমাদের দাবী ও ভরসা কতখানি তাহা আপনাকে কথায় লিখিয়া জানাইতে পারিব না।

এখন পর্য্যন্ত সাহিত্যই আমার একমাত্র সাধনা—সাহিত্যই আমার প্রাণ, আশীর্বাদ করুন, আমার সাহিত্যনিষ্ঠা যেন কোনও দিনই সঙ্কুচিত না হয়; যে মাতৃভাষা পূর্বসূরীগণের এবং এইযুগে আপনাদের কয়েকজনের বুকের রক্তে সঞ্জীবিত হইয়াছে তাহাকে মর্যাদা অনুযায়ী সঞ্জীবিত রাখিবার শক্তি যেন আমরা সংগ্রহ করিতে পারি। চারিদিক দিয়া যে ভয়াবহ দুর্দিনের সম্মুখীন হইতেছি তাহার চাপে পড়িয়া আমাদের সকল প্রাণশক্তির উৎস, সাহিত্য যেন খণ্ডিত না হয়—আপনাদের কল্যাণকামনা আমাদিগকে জয়যুক্ত করুক। আপনার নাটকটি আমি মনোযোগ দিয়াই পড়িব এবং যদি কোনও দিক দিয়া কোনও অসঙ্গতি চোখে পড়ে নির্ভয়ে আপনাকে জানাইব, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। সবটা একসঙ্গে পড়িতে পাইলে অবশ্য খুবই ভাল হইত কিন্তু তাহার যখন উপায় নাই অপেক্ষা করিয়া থাকিতেই হইবে।...

আমাদের প্রণাম জানিবেন ও শীঘ্র পত্রের উত্তর দিবেন। ইতি প্রণত

শ্রীসজনীকান্ত দাস

* * *

মেদিনীপুর
১৮।৩।৪০

শ্রীচরণেষু,

দাদা মহাশয়, ভাগ্যবিড়ম্বনায়, একান্তভাবে সাহিত্যব্রতী হইয়াও পলিটিক্যাল নেতার মত সারা বাংলাদেশে hurricane tour দিয়া ফিরিতে হইতেছে বলিয়া যথাসময়ে আপনার চিঠির জবাব দিতে পারি নাই এবং ঐ দুঃখেই ''সাহিত্য ও পলিটিক্স'' লিখিয়াছিলাম। আপনার ভাল লাগিয়াছে ইহা আমার ভাগ্য। আমার কিন্তু বাংলাদেশে জন্মিয়া বারম্বার এই কথাই মনে হইতেছে, পলিটিক্স ছাড়া কোনও বৃহত্তর প্রয়োজনে এদেশের সাহিত্যিকের আত্মোৎসর্গের কোনও অবকাশ নাই এবং যতদিন আমরা রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জ্জন না করিব ততদিন নিছক রসসাহিত্যও গৌণ বলিয়া গণ্য হইবে।

বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলীর কাজ সমাপ্ত করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মস্থান বীরসিংহে তাঁহার ভিটার উপর প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিমন্দিরে সেই অর্ঘ্য নিবেদন করিতে আসিয়াছিলাম। আমার জীবনের একটা বড় কর্ত্তব্য আজ সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি। বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী তিনটি বৃহৎখণ্ডে সম্পূর্ণ হইল।

আজই কলিকাতায় ফিরিব এবং ফিরিয়াই শনিবারের চিঠি শেষ করিতে হইবে, আপনার জীবনীটি সম্পূর্ণ করিতে হইবে। ''Notes'' যাহা পাইয়াছি তাহাতেই কাজ হইবে। কিন্তু আপনি আপনার এই নাতিটি সম্বন্ধে একটা মস্ত বড় ভুল করিয়াছেন। আপনার ওই স্বহস্ত লিখিত ''Notes''

আমি হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিব এত উদার আমাকে মনে করিলেন কেন? আপনাকে সমগ্র ''Notes''-এর কপিমাত্র পাঠাইব, আপনি কাহারও প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে উহা দিতে চাহিলে আবার স্বহস্তে উহা নকল করিয়া দিতে পারেন। যে জিনিষ আমি অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতেছি তাহা হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিতে পারিব না। যথাযথ নকল পাইবেন, একটু এদিক ওদিক হইবে না!

বৃহস্পতিবার রাত্রে আবার ঢাকা যাইতেছি, সেখানে বেতারে সাময়িক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ২৩শে মার্চ রাত্রি ৮টার সময় একটি বক্তৃতা দিতে হইবে। আপনি কলিকাতাতেই চিঠি দিবেন। আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি

প্রণতঃ সজনীকান্ত

* * *

RANJAN PUBLISHING HOUSE
25-2 MOHANBAGAN ROW, CALCUTTA
PHONE : 08. 037

১৯.৬.৪৪

শ্রীচরণেষু,

অনেকদিন আপনাকে চিঠি দি নি, তার কারণ মনের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। আগের অসুখটা শেষ পর্য্যন্ত কিড্‌নিতে স্টোন বলে ঘোষিত হয়েছিল। কিড্‌নির এই গোলমাল সম্প্রতি বাতে পর্য্যবসিত হয়ে আমাকে প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছে। কবরেজি চিকিৎসায় কিছু উপকার পাচ্ছি এবং আপনার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে এই চিঠি লিখতে বসেছি।

অনেক হাঙ্গামা করে শেষ পর্য্যন্ত গেনুবাবুর প্রার্থিত আপনার চারটি গল্পের ফাইল জোগাড় করলাম এবং এই সঙ্গে পাঠালাম। রেজিষ্ট্রি করেই পাঠাচ্ছি তবু প্রাপ্তি সংবাদটা দিবেন।

এখন কাজের মোহ অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি তবু মাথার মধ্যে অনেক কাজের খেয়াল ঘুরে ফিরে মনটাকে অশান্ত করে তুলছে। অনেক কিছু করব মনে মনে ঠিক করে বসেছিলাম—সে সব কাজ করবার লোক বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে না। আজ মনকে বোঝাবার চেষ্টা করছি (আপনার শেষ চিঠির নির্দ্দেশ অনুযায়ী) আমি এসব ভাববার কে? যিনি আমাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছেন তিনিই তাঁর কাজের ব্যবস্থা করবেন। যদি প্রয়োজন হয় আবার আমাকেই জোগাবেন। এই ধরনের ভাবনায় মনটা এখনও অনভ্যস্ত বলে এখনও ছট্‌ফটানি আসে। আশীর্ব্বাদ করুন সেটাও যেন যায়।

আষাঢ়ের শনিবারের চিঠি এখনও শেষ করতে পারিনি, কাগজের সমস্যাটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে কাগজ পেয়েছি, তারপর ছাপার কাজ আরম্ভ হয়েছে। আশা করছি কালকের মধ্যে শেষ হবে। তবে এভাবে লড়াই-কাজিয়া করে যে কতদিন চালাতে পারব জানি না। 'শনিবারের চিঠি'র কাজ এখনও শেষ হয়নি এটা বুঝি বলেই এখনও এতটা ব্যাকুলতা অনুভব করি।

আমি এখন অনেকটা regular হবার চেষ্টা করছি। দীর্ঘকালের অনভ্যাস তবু বুঝতে পারছি এখন একটা নিয়ম মেনে চলতেই হবে। নিজের দোষে ''বাধ্যতামূলক'' বিদায় নিতে হলে মনে বড় একটা ক্ষোভ থেকে যাবে।

আমার ও আপনার নাত-বৌ-এর প্রণাম জানবেন। আশা করি আপনার শরীর ও মনের অবস্থা ভালই আছে। ইতি

প্রণতঃ শ্রীসজনীকান্ত

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের (২৯ মে ১৮৬৫—৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩) ছেলেবেলা থেকে ছিল কবিতাপ্রীতি। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা তাঁকে অন্তরে দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। প্রথমে সেন্ট জেভিয়ার্স ও পরে সিটি কলেজে পড়ে

স্নাতকে প্রথম স্থান পেলে তিনি রিপন স্কলারশিপ পেতে আরম্ভ করেন। তাঁর সাফল্যে প্রীত হয়ে অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্র তাঁকে তখনকার 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র মুখপত্র 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জারে'র সহযোগী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৯০-তে তিনি ইংরেজি ভাষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করেন।

সম্পাদনার কাজে এসে তাঁর জীবনের এক নতুন দিক উদ্ঘাটিত হয়। ১৯০১ সাল থেকে তিনি ঐতিহাসিক 'প্রবাসী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন, যে-পত্রিকা তাঁর আমলে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে বহু গুণী লেখকের অমূল্য লেখনীতে সমৃদ্ধ হয়েছে ও মানুষকে অজস্র আনন্দ দান করেছে। ১৯০৭ সালে তিনি সেযুগের বিখ্যাত পত্রিকা 'Modern Review'-এর গোড়াপত্তন করেন। প্রকাশনা ও সম্পাদনার জগতে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁকে ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক বলে অভিহিত করা হয়। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর পত্রটি পেশা সংক্রান্ত, কিন্তু মনোরম।

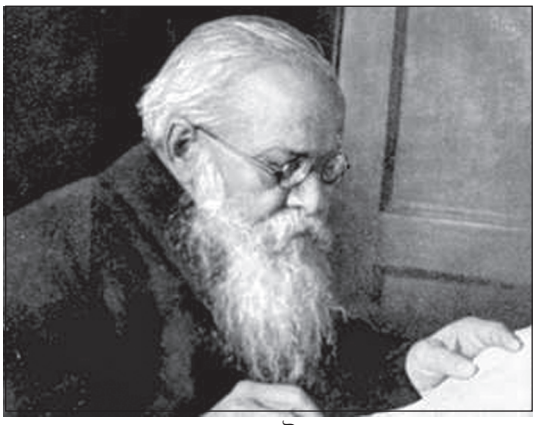

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

43, Wellesley Street,
কলিকাতা
তারিখ ৭ই ফাল্গুন, ১৩৪২

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনার প্রেরিত গল্পটি পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। উহা আমি ছাপিব—চৈত্রের প্রবাসীতেই ছাপিবার ইচ্ছা। বৈশাখের প্রবাসীর জন্য আর একটি পাঠাইলে বাধিত হইব। অবশ্য প্রতি মাসেই আপনাকে কষ্ট দিব না।...

আপনার গল্পটি আমি নিজেই আগাগোড়া পড়িয়াছি জানিবেন।

আপনি প্রবাসী দেখেন কি?

আপনি যে উপন্যাসটির প্রথম অধ্যায় ছোট গল্পের আকারে বসুমতীতে দিয়াছিলেন, তাহা কি সম্পূর্ণ লেখা হইয়াছে? তাহা হইলে একবার দেখিতে চাই। প্রথম অধ্যায়টি অল্পস্বল্প বদলাইয়া দিলেই চলিবে। রবীন্দ্রনাথ ''গোরা'', ''জীবনস্মৃতি'', ''শেষের কবিতা'' প্রভৃতি একাধিক বার বদলাইয়াছেন।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার লউন। এখনও অসুস্থই আছি। আপনার কুশল ত?

ভবদীয়
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

এরপরের চিঠি সেযুগের বিদগ্ধ পণ্ডিত প্রমথনাথ চৌধুরীর। জন্ম যশোহর, বাংলাদেশে (৭ আগস্ট ১৮৬৮—২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬)। পিতা দুর্গাদাস, মা মগ্নময়ী। ১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনে প্রথম শ্রেণিতে বি এ ও ১৮৯০ সালে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণিতে এম এ পাশ করে ১৮৯৩ সালে বিলেত যান এবং ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এসে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। পরে কিছুদিন আইন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ছিলেন সংগীতানুরাগী। যদিও বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার অবতারণা স্বামী বিবেকানন্দের সময়ই হয়ে গিয়েছিল, তবু সেই ভাষাকে মর্যাদা দান করে তিনি 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৯১৪)।

বহু জ্ঞানগর্ভ অথচ সরল প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর ছদ্মনাম 'বীরবল' থেকে বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট বীরবলী ধারা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রথম বিদ্রুপাত্মক প্রবন্ধ রচয়িতা হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'সনেট পঞ্চাশত', 'পদচারণ' ইত্যাদি। তিনি ফরাসি সনেটরীতি মেনে 'টিয়লেট', 'তের্জারিমা' ইত্যাদি রচনা করেন। তাঁর লিখিত গল্পসংকলনের মধ্যে রয়েছে 'চারইয়ারি কথা', 'আহুতি', 'নীললোহিত' ইত্যাদি। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর এক সংক্ষিপ্ত মনোগ্রাহী পত্র এখানে দর্শিত হল।

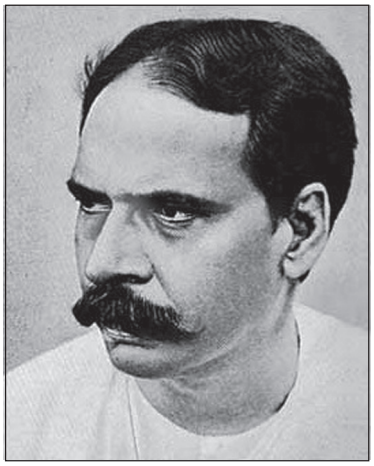

প্রমথনাথ চৌধুরী

20. MAYFAIR, BALLYGANJ

12/8/27

সবিনয় নিবেদন,

আমার চিঠি আপনি অনায়াসে প্রকাশ করতে পারেন—আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। যদি জানতুম যে সেটি ছাপার অক্ষরে উঠবে তাহলে চিঠিখানি আর একটু গুছিয়ে লিখতুম। তবে ও চিঠির ভাষায় বড় কিছু আসে যায় না—কারণ ওতে যা লিখেছি তা যথার্থই আমার মনের কথা। আমার মনে আট্‌পৌরে ও পোষাকী বলে দুজাতীয় ভাব নেই। সুতরাং আমি চিঠিতে যা লিখি ও কাগজে যা লিখি তা একই জিনিষ। কাগজের লেখা একটু মাজাঘষা—চিঠির তা নয়—এ দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই মাত্র। আমার চিঠি পড়ে আপনি খুশী হয়েছেন এতে আমি মহা খুশী।

ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৯/৯০— ২২ নভেম্বর ১৯৪৫)-এর জন্ম কলকাতায়। পিতা ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা নেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং জননী কাদম্বিনী দেবী ছিলেন বাংলার প্রথম মহিলা স্নাতক ও চিকিৎসক। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় ও বেথুন কলেজে পড়াশোনার পর জ্যোতির্ময়ী এম এ পাশ করে বেশ কিছু স্কুল-কলেজে শিক্ষকতার কাজ করেন। এরপর তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন ও ১৯২০ সালে কলকাতায় নারী স্বেচ্ছাসেবিকাবাহিনী গঠন করেন। গান্ধীজীর লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০) কলকাতায় ঊর্মিলা দেবীর নেতৃত্বে গঠিত 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'র তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। সমিতির পরিচালনায় বড়বাজারে বিদেশি বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং চলে। পেডির অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'Another Crucifixion' প্রবন্ধ 'Modern Review' পত্রিকায় প্রকাশ করে জ্যোতির্ময়ী আলোড়ন তোলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে কলকাতায় ১৪৪ ধারা থাকা সত্ত্বেও কলেজ স্কোয়ার থেকে বেরোয় মহিলাদের বিরাট শোকমিছিল (জুন ১৯২৫)। পরদিন ঊর্মিলা দেবী সহ জ্যোতির্ময়ীর ছ-মাসের কারাদণ্ড হয়। ২৬ জানুয়ারি ১৯৩১ কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টের আক্রমণের মুখে নিজে আহত হয়েও তিনি সুভাষচন্দ্রকে বাঁচান। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। ডাক্তারের বারণ থাকায় বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যোগ দিতে পারেননি। কিন্তু আজাদ হিন্দ বাহিনীর নায়কদের বিচারের সময় দেশব্যাপী

চাঞ্চল্যকর ডালহৌসি স্কোয়ার যাত্রার দাবির সত্যাগ্রহে যোগ দিতে যান। ফেরার সময় একটি মিলিটারি গাড়ি তাঁর গাড়িটিকে ধাক্কা দেয়। ফলে তিনি আহত হন ও মারা যান।

সেই মৃত্যুহীন প্রাণের এই অসম্পূর্ণ চিঠিটি এখানে দেওয়া হল, যেটি মনে হয় তিনি ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর শোকতপ্ত হৃদয়ে তাঁর প্রিয় দাদামশাইকে লিখেছিলেন।

৮ই ফাল্গুন ১৩৪৮
কলিকাতা
২।৫ কার্ত্তিক বসু লেন

শ্রীচরণকমলেষু—

দাদামহাশয়, আপনার চিঠি কৃষ্ণ নগরে পেয়েছিলাম। আপনার জন্মদিনের প্রণাম জানিয়ে চিঠি দিব ইচ্ছা হল। কাগজে দেখলাম আপনার জন্মদিনের কথা। শনিবারের চিঠি লিখেছে আপনার কথায়, মহাগুরু নিপাতের বৎসর। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে।

একটীমাত্র লাইনে আপনি যে ক্ষোভ দুঃখ প্রকাশ করেছেন, 'রবিহীন জগতে বেঁচে থাকা' এর চেয়ে আর গভীর ভাবে কি বলা যেত। সত্যিই যেন সমস্ত বাংলাদেশ বাংলাভাষা বিধবা হয়েছে, নিঃস্ব হয়ে গেছে, রিক্ত হয়ে রয়েছে। সুরেশ আমাকে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কথা কিছু লিখুন। আমি তাঁকে বার তিনচার দেখেছি—দু চারিটী কথাও শুনেছি তাঁর। কিন্তু আমি অপরূপ সূর্য্যোদয় দেখেছি;—মুগ্ধ হয়ে, আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে দেখেছি, বলা যায়। কিন্তু সূর্য্যোদয় আমাকে দেখেছেন, চেনেন বলা যায় না। আমি রবীন্দ্রনাথকে সেইরকমই দেখেছি। বলা যায় না তাঁর কথা, সঙ্কোচ হয়। জীবনের আশা দুঃখ আনন্দ ক্ষোভ গ্লানি শান্তি সবই তাঁর রচনা দিয়ে মানুষকে ঘিরে আছে চিরদিনের মত যেন। এইটুকু-ই সত্য বলে মনে হয়। (অসমাপ্ত)

পরের পত্রটি সেকালের আর এক স্বনামধন্য সুধীজন ও গল্পকার উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১২ অক্টোবর ১৮৮১—৩০ জানুয়ারি ১৯৬০)। তাঁর জন্ম বিহারের ভাগলপুর জেলায়। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মামা। 'শ্রীকান্তে' বর্ণিত সেই ভাগলপুরের মামার বাড়িতেই কেটেছিল শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলা।

উপেন্দ্রনাথ বি এল পাশ করে ভাগলপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন ও পরে সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরই সম্পাদনায় প্রথম শ্রেণির মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হতে থাকে। পরে আট বছর তিনি 'গল্পভারতী'-র সম্পাদক ছিলেন। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সপ্তক'। অন্যান্য গল্পসংকলনের মধ্যে রয়েছে 'রাজপথ', 'দিকশূল', 'অস্তরাগ', 'স্মৃতিকথা' (চারখণ্ডে) প্রভৃতি। সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতিরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৫ সালে তিনি 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' পান। তাঁর একটি সুন্দর চিঠি দেওয়া হল।

১১ই চৈত্র ১৩৫৪

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, কেদার-জয়ন্তী অভ্যর্থনা সমিতি,
পুর্ণিয়া

সবিনয় নিবেদন,

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শুভ জয়ন্তী-উৎসবে যোগ দিবার জন্য আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। আমাদের দেশের বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ এবং প্রবীণতম সাহিত্যিককে সম্বর্ধিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া আপনারা কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন, এবং লেখক তথা পাঠক আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল পুর্ণিয়ায় উপস্থিত হইয়া এই জয়ন্তী-উৎসবে সাক্ষাৎভাবে যোগ দিবার সৌভাগ্যলাভ করি,—কিন্তু অনতিবর্তনীয় কারণে কলিকাতায় আবদ্ধ হইয়া থাকিবার বাধা সে ইচ্ছায় বাদ সাধিল। অগত্যা বাধ্য হইয়া আপনার মধ্যবর্তিতায় মাননীয় শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার প্রণাম এবং আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই লেখাটুকু যথাকালে তাঁহার হস্তে পৌঁছাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

কবি হইলে তাঁহার কানে-কানে আজ বলিতাম—
যে-গান তুমি গাহিয়া গেলে কবি,
আঁকিয়া গেলে যে-ছবি অতুলনীয়।
সুচিরকাল তাহার রেশে-রঙে
অবিস্মৃত রহিবে তুমি প্রিয়!

জয়ন্তী উৎসবের শুভ মুহূর্তে আমি ঐকান্তিক চিত্তে শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আয়ু এবং স্বাস্থ্য কামনা করি। ইতি

নমস্কারান্তে
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সুবোধ রায়

পরের পত্রটি সুবোধচন্দ্র রায়ের (১৯০৯—১৯৮৫)। জন্ম কলকাতায়। এক বিরল প্রতিভাশালী মানুষ ছিলেন তিনি। ছিলেন শিক্ষাব্রতী ও 'লাইট হাউস ফর দি ব্লাইন্ড' সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। মাত্র আট বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারান। ১৯২৭ সালে ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। সেন্ট পলস্ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের কৃতী ছাত্র। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলকাতা ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লরেলসহ পি এইচ ডি ডিগ্রি ও রয়্যাল ন্যাশানাল ইনস্টিটিউট ফর ব্লাইন্ড থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেন। দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন বৃত্তি নিয়ে ভারতে ও বিদেশে ভ্রমণ করেছেন। লরেটো কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। তাঁরই চেষ্টায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ-বিভাগে ঐচ্ছিক বিষয় 'ব্রেইল'-এর স্থান হয়। আমেরিকাতেও অধ্যাপনার কাজ করেছেন। দর্শনের ছাত্র ও ধর্মীয় বিষয়ে নিষ্ঠাবান ছিলেন। রচিত গ্রন্থ—'The Blind in India and Abroad'। বহু পত্রপত্রিকায় লিখতেন।

বিজয়া দশমী
৩০।৯।১৯৪১

শ্রীচরণেষু দাদামশাই,

আপনি আমার বিজয়া দশমীর সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করবেন।

বহুদিন পরে আপনাকে চিঠি দিচ্ছি। একদিন ছিল যখন আপনি আমাদেরই দাদামশাই ছিলেন, কয়েকজন নিঃস্বার্থ তরুণহৃদয়ের আশা ও আনন্দের সঙ্কীর্ণ পরিধিকে ঘিরে আপনি গোষ্ঠীপতি হয়ে বিরাজ করতেন। আজ আপনি সারা বাঙ্গলার—তাছাড়া আপনার এই বয়স। এখন আপনাকে উত্যক্ত করতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করি। সম্প্রতি কবিগুরুর তিরোধানে আপনি সজনীবাবুকে যে সকরুণ ও মর্মস্পর্শী চিঠিখানি লিখেছেন, তারপরে আপনাকে চিঠি না লিখে থাকতে পারলাম না। অল্পদিনের জন্য হলেও আপনার কাছ থেকে যে অপার্থিব স্নেহ ও আশীর্বাদ পেয়েছি, আমার জীবনে সে একটা অতি বড় পাথেয়। আপনার মধ্যে আমি অতীত বাঙ্গলার এমন একটি সুমধুর অকৃত্রিম সৌজন্য ও রসোচ্ছল প্রাণমূর্ত্তির সন্ধান পেয়েছিলাম, যার স্মৃতি আমার মন থেকে কোনোদিন মুছবে না। আজিকার দিনে বাঙ্গলার গতযুগের সেই প্রাণমূর্ত্তির চরণে প্রণতি জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। ইতি স্নেহধন্য

সুবোধ রায়

* * *

বিজয়শ্রী, চুঁচুড়া
১৫ই চৈত্র ১৩৫৪

অশেষ ভক্তিভাজন
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দাদামহাশয়, শ্রীচরণঃ কমলেষু

পেয়েছিলে ব্যথাভরা সত্যসন্ধ চোখ,
যা দিয়ে হেরিলে তুমি এই বিশ্বলোক;
হাসির আড়ালে তব অন্তর-বেদনা,
রচিল ভারতী-তীর্থে নব আরাধনা।

রসিক সজ্জন তুমি, স্নেহরস তব,
অকুণ্ঠিত, সীমাহীন, অতি-অভিনব,
কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ পাইয়া পরশ
ধন্য হোলো লভি চিত্তে অমৃত-হরষ।

তাই আজি গৃহ তব তীর্থসম লাগে,
সানন্দে মিলেছে সবে অতি-অনুরাগে;
তব আশীর্ব্বাদ-স্পর্শ লভিল যে-জন,
হইল সার্থকমন্য তাহার জীবন।
সর্ব্বাগ্রজ সাহিত্যিক! সর্ব্ব-শ্রদ্ধাহেতু
সেকাল-একাল-মাঝে রচিয়াছ সেতু।

ইতি
স্নেহধন্য সুবোধ রায়

পরবর্তী পত্র আর এক স্বনামধন্য গুণীজন নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। জন্ম হুগলি জেলার বৈঁচী গ্রামে (১৮৯৫—১৯৭১)। তিনি স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে আইনে স্নাতক হন ও ইউনিভার্সিটি কলেজ, লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। ভারতের সুপ্রিমকোর্টে সিনিয়র অ্যাডভোকেটের কাজে যোগ দিয়ে পরে কলকাতা হাইকোর্টে জজ হিসেবে আসেন। কর্মজীবনে বড় বড় পদে ছিলেন, যেমন বার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার কোষাধ্যক্ষ, অল ইন্ডিয়া সিভিল লাইব্রেরি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি। তিনি অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার প্রার্থী হয়ে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে নির্দল প্রার্থী হিসেবে বর্ধমান থেকে পুনর্নির্বাচিত হন (১৯৬৭-১৯৭১)। অবিভাজিত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। ১৯৭১-এ তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই আসন থেকেই নির্বাচিত হন।

শান্তিনিকেতন, বীরভূম
২৬ মার্চ ১৯৪২

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার পত্র পেয়েছিলাম যথাসময়েই। সপ্তাহখানেক কলকাতায় গিয়েছিলাম ছুটি নিয়ে ‘পলায়নে’র ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে। এখানেও ছুটির মুখে পড়েছে কাজের চাপ। নানা কারণে উত্তর দিতে

দেরী করে ফেল্লাম; বিশেষ লজ্জিত আছি সেজন্যে।

'সাহিত্যিকা'র ছেলেরা আপনার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতার্থ হয়েছে। গত অধিবেশনে সেটি সাধারণের সামনে পাঠ করা হল। আপনার উপদেশ তারা অন্তরে গ্রহণ করবে আমার বিশ্বাস।

গুরুদেবের 'গল্পসল্প' আশা করি এতদিনে পেয়েছেন; আমি পাঠাতে বলেছিলাম প্রকাশ-বিভাগের সম্পাদককে। ভাষার যাদুকরের শেষ ভাষার রূপ দেখি আর নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর কথা চিন্তা করি, তাঁকে স্মরণ করি। বইটি যখন লেখা হয় কবির বড় কাছে থাকার সুযোগ তখন ঘটেছিল। অনেক আলোচনাও হত। ভাষার এই ঝরঝরে নতুন ছাঁচের পরীক্ষার মুখে তাঁর মৃত্যু আমার কাছে তাই অকালমৃত্যুর মতই মনে হয়েছিল। একদিন তাঁকে বলেছিলাম 'আগামীকালের উপযোগী চাঁছাছোলা অথচ সরসসুন্দর ভাষা এতদিনে পেলাম।' উত্তরে কবি বলেছিলেন—'ধরে রাখতে পারবে এই ভাষাকে? মুঠোর সে-জোর হয়েছে বলে বিশ্বাস হয়? এ আমার অনেক শ্রম অনেক সাধনালব্ধ সম্পদ।' শুনে সত্যিই বুক কেঁপে উঠেছিল।

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আপনার সান্নিধ্যে কদিন বড় আনন্দে কাটিয়ে এলাম, কৃতজ্ঞতাটুকু জানিয়ে আসতে হয়ত পারি নি যথোপযুক্ত উপায়ে। সে ত্রুটির ক্ষমা চাই। নন্দলাল বসু মহাশয় ও প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে আপনার কুশল সংবাদ দিয়েছি এখানে ফিরে। রথীন্দ্রনাথও সাগ্রহে সব খবর নিলেন।

শনিবারের চিঠিতে আপনার ভাষণটি আবার পড়লাম এবং পূর্ণতর রসগ্রহণ করিলাম। বুকের কথা নিঙড়ে লেখা অথচ কী সরস ভঙ্গীতে!

আশা করি দেহে মনে সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। আমরাও ভাল আছি। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানবেন। আর আর সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ দেবেন।

ইতি আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী
নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত বহু গুণীজনের পত্রসম্ভার এখানে পরিবেশিত হল। এঁরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বমহিমায় বিকশিত। অথচ এঁদের স্মৃতি আজ আমাদের কাছে হয় ধূসর, মলিন, নয়তো বা চলে গিয়েছে বিস্মৃতির আড়ালে। চিঠিগুলির অবস্থাও শোচনীয়। প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো চিঠি যেভাবেই সংরক্ষিত থাকুক না কেন, তার অবস্থা করুণ হয়ে যায়। কাগজগুলি হলুদ হতে হতে হয়ে যায় ভঙ্গুর। তবু তাদের যথাসাধ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রবন্ধে শুধু এই দীর্ঘ একশত বছরের পুরোনো পত্রগুলিই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল না, নতুন করে আত্মপ্রকাশ করলেন সেইসব পত্রলেখকও—যাঁদের অবদানের কাহিনি চিরস্মরণীয়। বাংলার নবজাগরণকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিশ্বের দরবারে।

(সমাপ্ত)